॥ কিরাতার্জুনীয় কাব্যের বঙ্গানুবাদ ॥

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধকাল ব্যাপিয়া যে বিভিন্ন কাব্যের অনুবাদ হইয়াছে তন্মধ্যে 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যের মাত্র দুইখানি অনুবাদ পাওয়া যায়। অনুবাদ-গ্রন্থগুলির প্রকাশকালের ক্রম অনুসারে প্রথমেই জীবনকৃষ্ণ সেনের নাম করা যাইতে পারে। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে [১২৮৯ সালে] তিনি কিরাতার্জুনীয় কাব্যের যে বঙ্গানুবাদ রচনা করেন, তার ছিল প্রধানতঃ তাঁহার সুকল্পিত বর্ণনা। মূল কবি ভারবি তাঁহার এই কাব্যের বিভিন্ন সর্গ বিভাগ করিয়াছেন। কিন্তু জীবনকৃষ্ণ সর্গের স্থলে অঙ্ক বিভাগ করেন এবং তিনি গর্ভাঙ্কও দেখাইয়াছেন। চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় অনুবাদক মতিলাল শর্ম্মা ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে [১২৯১ বঙ্গাব্দে] তাঁহার রচনা প্রকাশ করেন। পূর্ববর্তী অনুবাদের তুলনায় এখানে অনুবাদক অনেকটা সতর্ক ছিলেন। কোনো কোনো স্থলে আক্ষরিক অনুবাদের লক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছে। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদ মূলের তুলনায় অনেকটা দীর্ঘ হইয়াছে। মূল ষষ্ঠ সর্গ পর্যন্ত অনুবাদ করিয়া তিনিও তাঁহার রচনা সমাপ্ত করেন।

মূল কাব্যের প্রারম্ভে প্রজাবর্গের প্রতি কুরুরাজ দুর্যোধনের ব্যবহার অবগতির জন্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যে বনেচরকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আলোচ্য অনুবাদে তাহার পরিবর্তে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের কথোপকথন এবং পরে দ্রৌপদীর উক্তির বর্ণনা রহিয়াছে।

জীবনকৃষ্ণ সেন রচিত অনূদিত প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেও অনুবাদকের সুকল্পিত বর্ণনায় অপ্সরাগণের কথা এবং তাহাদের নৃত্যগীতের বর্ণনা আছে। কল্পিত বর্ণনার নিদর্শনস্বরূপ বলা যায় –

যুধিষ্ঠির – আছ স্থির ধর্ম-ব্রতে ভাই ধনঞ্জয়
কাঁদ কি অন্তরে কভু পাণ্ডব দুর্গতি লাগি !
কাঁদে ভাই বৃকোদর,
কাঁদেও নকুল কভু সহদেব সনে,
পঞ্চালি কাঁদিল দেখি সবার বিক্রম
উগ্রভাস-উগ্রবীর, অন্যায় কীর্ত্তন গায়
তাড়িবারে প্রবল বাহিনী কুরু ;
রথি যায় ভীষ্মদেব ,
দ্রোণগুরু সংগ্রাম নায়ক,
কর্ণ কৃপ অশ্বত্থামা ভূরিশ্রবা আদি
বীর্য্যবান রথি সব দুর্য্যোধন পক্ষ,
আমার ভরসামাত্র তোমার গাণ্ডীব
কিন্তু দিন এ নয় সে দিন।

অপ্সরাগণের গানের বর্ণনায় রহিয়াছে –

মোহন মঙ্গল মধুর সাজ হে।
মন্দ সমীর বয় সোহাগ রাজ হে।
চিকণ চিকুরে কুসুম মালা।
সুরাগে রঞ্জিত সুর সুরবালা।
নন্দন সুখ সাধ সাধি বিজন হে।

মূল দ্বিতীয় সর্গে বৃকোদর দ্রৌপদীর হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিলেন এবং ক্রোধ উদ্দীপনের নিমিত্ত দ্রৌপদীও নানা প্রকার চেষ্টা করেন। তখন তাঁহাদের সমীপে অকস্মাৎ পরাশরতনয় বেদব্যাস সমাগত হইলেন।

কিন্তু জীবনকৃষ্ণ সেনের বর্ণনা ভিন্নরূপ। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের প্রারম্ভেই স্তুতিগান রহিয়াছে এবং গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশের বর্ণনা আছে। যেমন –

নারদ – সকলি নূতন আজি,
সুর্গে সুর্গবাসী ক্ষুণ্ণ ক্ষুণ্ণ শচীপতি,
ইন্দ্রালয়ে অপ্সরার নাহি নৃত্যগীত,
নন্দন নীরব দেব! কি আর কহিব।

তাছাড়া হর-পার্ব্বতীর যেরূপ উক্তি প্রত্যুক্তি অনুবাদে দেখা যায় তাহার সহিতও মূলের কোনো মিল নাই।

অনূদিত দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে অতি নিম্নস্তরের ভাঁড়ামির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন –

প্র, কু – হ্যারে নন্দি! ননদিরে কি দিয়েছিস্ বলে,
থেকে থেকে সেকী মাগি উঠচে কেন জ্বলে?
শিব সঙ্গে ফিরি মোরা শিবগত প্রাণ
জেনে শুনে বুড়ো কেন করাস অপমান?
নন্দি – যখন তখন শিব সঙ্গে রঙ্গ ভাল নয়।
সেই হেতু কুঁজি তোমা দেখায়েছি ভয়॥

জীবনকৃষ্ণ সেন রচিত তৃতীয় অঙ্কের বর্ণনাও অনুবাদকের সুকল্পিত রচনা। "মহাদেবের বরুণাস্ত্রে অগ্নিবাণ ক্ষয়" - "মহাদেব কর্তৃক গাণ্ডীবহরণ" - "মহাদেবের সন্ধানে অর্জুনের মূর্চ্ছা" - "উভয়ের মল্লযুদ্ধ ও মহাদেবের গুহাবে অর্জুনের পুনর্মূর্চ্ছার" কোনো উল্লেখ মূলে দেখা যায় না। শিবের অনুচরগণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধের বর্ণনা মূল কাব্যে দেখা গেলেও অনুবাদক স্বয়ং মহাদেবের সহিতই অর্জুনের যুদ্ধের বর্ণনা দিয়াছেন।

অনূদিত চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে উর্ব্বশী - মেনকা প্রভৃতির গানের বর্ণনা এবং হা হা - হু হু নামক গন্ধর্বের বর্ণনা অনুবাদকের সুকল্পিত। হু - হু নামক গন্ধর্ব একস্থলে বলিয়াছেন -

হু হু - উঠ মেনকা, উর্ব্বশী, রম্ভা
হাস কেন সবে ?

উর্ব্বশী - কাটা কাণ ঢাকা রাখ,
তাই হাসি পায়।

এ সকল অংশ কোন সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না।

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে উর্ব্বশীর শয়ন কক্ষে আগমন ও দাসীরূপে তাঁহার জীবন মন অর্জুনকে সমর্পণের ঘটনার সহিত মূলের কোন সাদৃশ্য নাই।

আবার, চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় ও চতুর্থ গর্ভাঙ্কের বর্ণনাও সম্পূর্ণ মূলবহির্ভূত রচনা। ইহা যেন জীবনকৃষ্ণ সেন রচিত মূল গ্রন্থের নব রূপান্তর।

অপ্সর ও অপ্সরাগণের নৃত্যগীতের দ্বারাই অনুবাদক তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। মূল কাহিনীকে অবলম্বন করার চেষ্টা করিলেও অনুবাদক বঙ্গানুবাদে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেখাইয়াছেন। সুতরাং মূলের সহিত অনুবাদের কোন সাদৃশ্য নাই। ইহাকে জীবনকৃষ্ণ সেনের মৌলিক রচনা গ্রন্থ বলা চলে।

মতিলাল শর্মা 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যের অনুবাদ করেন ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে [১২৯১ বঙ্গাব্দ]। পূর্ববর্তী অনুবাদের তুলনায় তাঁহার এই বঙ্গানুবাদে অনেকাংশে মূলানুসরণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘ বিজ্ঞাপন অংশের এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন যে, মূলের অবিকল অনুবাদ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই উদ্যম সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে বলা চলে না। অনুবাদ কোথাও কোথাও মূলানুগ হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে ভাবানুবাদ ও অতিবিস্তারের নিদর্শনও দুর্লভ নহে। অনুবাদের নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

প্রথম সর্গের প্রথম শ্লোকের অনুবাদে রহিয়াছে –

> "মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন দুর্যোধনের কুমন্ত্রণায় রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দ্বৈতবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন একজন বনেচরকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া রাজ্য মধ্যে পাঠাইয়া দেন। দুর্যোধন কিরূপে রাজ্যশাসন,

কি নিয়মে প্রজাপালন করিতেছেন তাহা জানিবার জন্যই তিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন , প্রজাপুঞ্জের অনুরাগ আকর্ষণ ব্যতিরেকে যে রাজ্যের উন্নতি হয় না ইহা বলাই বাহুল্যমাত্র । সেই শবর ব্রহ্মচারীবেশে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উক্ত বনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মহারাজের চরণে যথাবিহিত প্রণাম করিল ।"[১]

– এখানে মূল বিষয়ের বিস্তার লক্ষ্য করা যায় ।

আবার, প্রথম সর্গের ২৪ সংখ্যক শ্লোকের বঙ্গানুবাদে দেখা যায় –

" কথা প্রসঙ্গে কেহ যদি আপনার নাম করে – তাহা হইলে অর্জুনের অতুল পরাক্রম দুর্যোধনের স্মৃতিপথারূঢ় হয়, তখন তিনি আনতবদনে দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন ।"[২]

– মূলের "মন্ত্রপদাদিবোরগ" শব্দটির কোনো উল্লেখ এখানে নাই । বস্তুতঃ রূপক-উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারযুক্ত বর্ণনায় প্রায় সর্বত্র অনুবাদক নীরব রহিয়াছেন ।

---

১. শ্রিয়ঃ কুরূণামধিপস্য পালনীং
প্রজাসু বৃত্তিং যমযুঙ্ক্ত বেদিতুম্ ।
স বর্ণিলিঙ্গী বিদিতঃ সমাযযৌ
যুধিষ্ঠিরং দ্বৈতবনে বনেচরঃ ॥ ১ ॥ ১ম সর্গ ।

২. কথা প্রসঙ্গেন জনৈরুদাহৃতা –
দনুস্মৃতাখণ্ডল-সূনুবিক্রমঃ ।
তবাভিধানাদ্ ব্যথতে নতাননঃ
সুদুঃসহাৎ মন্ত্রপদাদিবোরগঃ ॥২৪ ॥ ১ম সর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গের চতুর্থ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে দেখা যায় —

> " দ্রৌপদীর বাক্যগুলি বীর্য্যবান ঔষধের তুল্য —
> ঔষধ যেমন রোগীর পক্ষে সেবনে কষ্টজনক, ইহাও
> তেমনি হীনবলদিগের সম্মুখে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্লেশের নিদান ।
> ঔষধ যেমন পরিণামে সুখদায়ক ইহাও তেমনি অবদানে
> প্রীতিপ্রদ , ঔষধ যেমন স্বাস্থ্যজনক বলিয়া অর্থভূয়িষ্ঠ ,
> ঔষধ অল্পমাত্রায় প্রযুক্ত হইয়াও যেমন আরোগ্য বল
> প্রভৃতি অনেক উপকার করিয়া থাকে, ইহাও তেমনি
> অল্পপরিমিত হইয়াও মান, প্রাণ, রাজ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি
> প্রভূত সংফল অর্পণ করিবে । " ৩

— এখানে অনেকটা মূলানুসরণের নিদর্শন থাকিলেও মূলের "অতিবীর্য্যবতীব ভেষজে"র অনুবাদ করিতে গিয়া মতিলাল শর্মা যেন ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

দ্বিতীয় সর্গের একাদশ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদকে অপেক্ষাকৃত আক্ষরিক অনুবাদ বলা চলে । দ্বিতীয়ার চন্দ্রের সহিত রাজার তুলনামূলক বর্ণনার অনুবাদে দেখা যায় —

> " স্বাভাবিক প্রীতিপ্রদ কৌমুদীময় নবোদিত চন্দ্রমা
> যখন ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতে থাকেন তখন জনসাধারণ
> আন্তরিক ভক্তিভরে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে ।
> সেইরূপ প্রজাগণও যদি অবনতিপ্রাপ্ত ভূপতি নৈসর্গিক

---

৩. পরিণামসুখে গরীয়সি ব্যর্থকোহস্মিন্‌বচসি ক্ষতৌজসাম্ ।
অতিবীর্য্যবতীব ভেষজে বহুরল্পীয়সি দৃশ্যতে গুণঃ ॥ ৪ ॥ ২য় সর্গ ।

আনন্দময় ব্রহ্মতেজে পরিপূর্ণ হইয়া উন্নতিমার্গে
ধাবমান হন তবে তৎপ্রতি সম্যক অনুরক্ত হইয়া
উঠে।" ৪

— ইহা বর্ণনার যথোপযুক্ত ভাষান্তরের দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় সর্গের প্রথম শ্লোকের অনুবাদে তিনি লিখিয়াছেন —

"মহর্ষি ব্যাসদেব সুখে উপবেশন করিয়াছেন;
শারদীয় চন্দ্রমার কৌমুদী রাশির ন্যায় তদীয়
মনোহর শরীর জ্যোতি ঊর্ধ্বে প্রসারিত হইতেছে।
তাঁহার দেহের প্রভা ঈষৎ নীল, মস্তকে পিঙ্গল
জটাভার দেখিয়াই বোধ হইতেছে যেন নবনীরদে
বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে।" ৫

— অনুবাদের একই রীতি এখানে প্রচলিত। অনুবাদকের শ্রম ও অধ্যবসায়-গুণের লক্ষণ এখানে লক্ষ্য করা যায়।

গ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে চতুর্থ সর্গের দ্বিতীয় সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে রহিয়াছে —

"দেখিলেন গ্রামের সীমা ও প্রদেশ কর্দ্দম পরিশূন্য।
শালিধান্যের স্তম্ভগুলি সম্পূর্ণ অবনত, সরোবর সকল

---

৪. ক্ষয়যুক্তমপি স্বভাবজ মদধত ধাম শিবং সমৃদ্ধয়ে।
প্রণমত্যনপায়মুৎথিতং প্রতিপচ্চন্দ্রমিব প্রজা নৃপম্ ॥ ১১ ॥ ২য় সর্গ।

৫. ততঃ শরচ্চন্দ্রকরাভিরামৈ-রুৎসর্পিভিঃ প্রাংশুমিবাংশুজালৈঃ।
বিভ্রাণমানীলরুচং পিশঙ্গীর্জটাস্তড়িত্বন্তমিবাম্বুবাহম্ ॥ ১ ॥ ৩য় সর্গ।

কমল সমূহে পরিপূর্ণ । প্রান্তভূমি অর্জ্জুনকে উপহার দিবার জন্যই যেন এই শারদীয় শোভা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে । পার্থ পরম প্রীতিলাভ করিলেন ।" ৬

শরৎকালের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় অনুবাদক যথাসম্ভব মূল অনুসরণেরই পক্ষপাতী । স্থূল অর্থ প্রকাশের প্রতি তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি থাকিলেও মূল কাব্যের স্বাদ ইহাতে বিরল । কেননা মূলের ধ্বনিগাম্ভীর্য বাংলা গদ্যে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব । গদ্যানুবাদে মূল বিষয় ব্যক্ত করা সহজ, কিন্তু ইহা মূলের সমস্ত সৌন্দর্যের বাহন নহে ।

পঞ্চম সর্গে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হিমালয় বর্ণনা রহিয়াছে । তৃতীয় সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে দেখা যায় –

> " হিমালয় গিরিতে ভূলোক, ভুবোলোক ও স্বর্লোক সকল লোকই বাস করিতেছে । কিন্তু কেহই কাহাকেও জানে না । ভগবান ভূতভাবন যেন নিজ সামর্থ্য প্রকটনের জন্য সর্ব্বজগতের প্রতিকৃতি স্বরূপ হিমবান্ নির্মাণ করিয়াছেন ।" ৭

– মূলানুসরণের প্রতি অনুবাদক এখানেও সতর্ক ছিলেন ।

---

৬. বিনম্রশালিপ্রসবৌঘশালিনী–রপেতপঙ্কাঃ সসরোরুহাম্ভসঃ ।
ননন্দ পশ্যানুপসীম স স্থলী রূপায়ণীভূত শরদ্‌গুণশ্রিয়ঃ ॥২॥ ৪র্থ সর্গ ।

৭. ক্ষিতিনভঃ সুরলোকনিবাসিভিঃ কৃতনিকেতমদৃষ্ট পরস্পরৈঃ ।
প্রথয়িতুং বিভূতিমভিনির্মিত শতিনিধিং জগতামিব শম্ভুনা ॥৩॥৫মসর্গ ।

মতিলাল শর্মা "যুবতী প্রস্থান" নামক ষষ্ঠ সর্গ অনুবাদ করিয়াই অনূদিত গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। আলোচ্য সর্গের প্রথম শ্লোকের অনুবাদে ইন্দ্রকীল পর্ব্বতের বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন —

> "ইন্দ্রকীল পর্ব্বতের সানুদেশ সুবর্ণরাশিতে নির্ম্মিত। মনোহর রূপ সম্পন্ন অর্জ্জুন, চিত্ত সংযত করিয়া তাহার উপরে আরোহণ করিলেন এবং ভগবতী ভাগীরথী যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।"[৮]

ইহাও অনেকটা মূলানুসরণের দৃষ্টান্ত। দেবরাজ ইন্দ্র গুহ্যকমুখে প্রিয়পুত্রের তপস্যার বিষয় অবগত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ধ্যান-যোগে অর্জ্জুনের ভক্তির বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইলেও নিয়মে তাঁহার কতদূর স্থিরতা জন্মিয়াছিল তাহা জানিবার জন্য সুরসুন্দরীগণকে তিনি আদেশ দিলেন এবং সুন্দরীগণ দেবরাজের আজ্ঞা পাইয়া পরমানন্দে অর্জ্জুন সমীপে গমন করিলেন। এখানেই মতিলাল শর্মা তাঁহার কাব্যগ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

প্রথম সর্গের অনুবাদে মূলের ব্যতিক্রম কিছু থাকিলেও পরবর্তী সর্গগুলিতে অনুবাদ-কার্যে তাঁহার নিষ্ঠার প্রমাণ রহিয়াছে। পদ্যানুবাদের চেয়ে গদ্যানুবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই অধিকাংশ কাব্য গ্রন্থের অনুবাদে অনুবাদকগণ গদ্যাকারে মূল অর্থ প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন।

---

৮. রুচিরাকৃতিঃ কনকসানুমথো পরমঃ পুমানিব পতিং পততাম্।
ধৃতসৎপথস্ত্রিপথগামভিতঃ সমতমারুরোহ পুরুহূতসুতঃ ॥১॥ ৬ষ্ঠ সর্গ।

পরবর্তীকালে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র দাস 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যের যে অনুবাদ করেন তাহা যথার্থই অনুবাদকের সার্থক রচনা। নবীনচন্দ্র নিজেও ছিলেন কবি। তাঁহার এই কাব্যানুবাদে কবি-মনের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটিয়াছে বলা চলে। তবে ইহাও আমাদের নির্দ্দিষ্ট কালপর্বের বহির্ভূত রচনা।

সংস্কৃত লেখকদের নামের তালিকায় বর্ণের ক্রম অনুসারে ভারবির পরই মাঘের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধকালে রচিত সংস্কৃত কাব্যের বঙ্গানুবাদের যে প্রয়াস লক্ষিত হয় তাহাতে অন্যান্য কাব্যের তুলনায় "শিশুপালবধ" কাব্যের অনুবাদে অনুবাদকের আগ্রহ অপেক্ষাকৃত কম বলিয়াই মনে হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র দাস এই কাব্যের আংশিক অনুবাদ করেন। মূল কাব্যের বিষয় বিংশ সর্গে সমাপ্ত হয়। কিন্তু নবীনচন্দ্র দাস দুইটি সর্গ অনুবাদ করিয়াই তাঁহার অনূদিত গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এই আংশিক অনুবাদে তাঁহার কবিহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু অনুবাদের প্রকৃতি নিরীক্ষায় নির্ব্বাচিত অংশের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই অনুবাদ-গ্রন্থখানিও আমাদের কালপর্বের বহির্ভূত হওয়ায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইল না।